পেনসিলে লেখা খবর

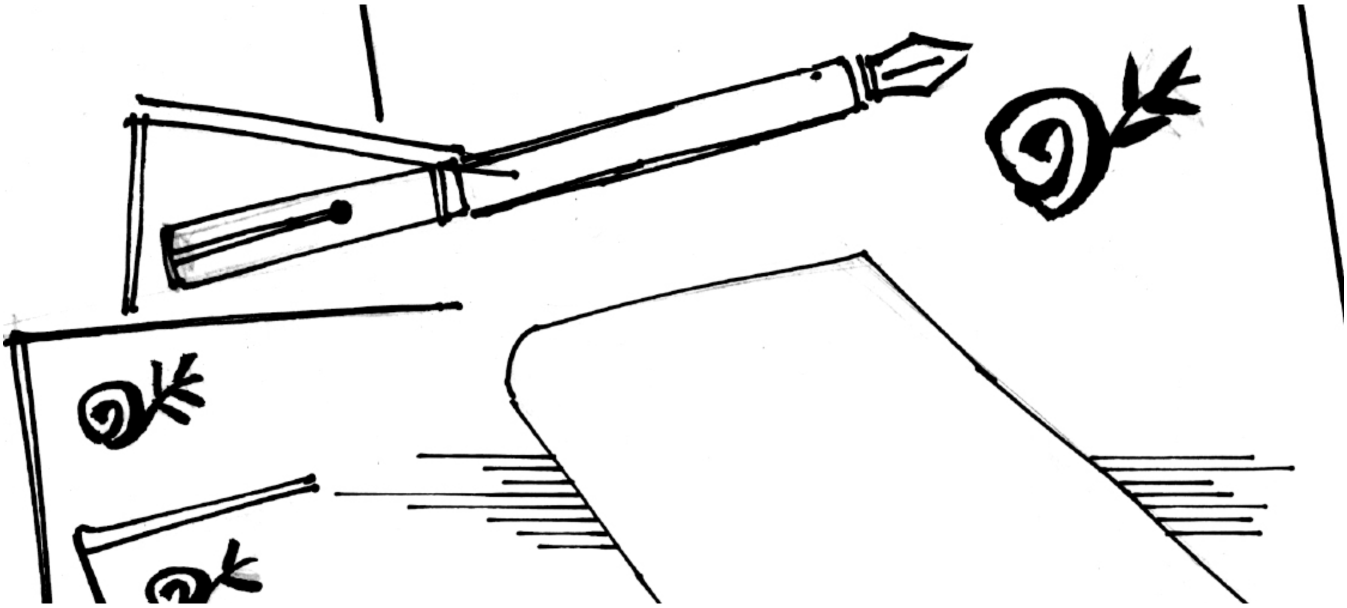

March 15, 2021 0 Comments

দিনপঞ্জি

অমর মিত্র

এখন আমি ঘরবন্দি। মশারির ভেতরেই যেন বন্দি। এই শহর, এই রাজ্য, এই দেশ, প্রবাস সবই যেন আমার ছ-সাত বছর বয়সে মশারির ভিতরের দিনযাপনে ফিরে গেছে। আমি ছোটবেলায় ম্যালেরিয়ায় ভুগেছিলাম কি না মনে নেই, টাইফয়েডে দু-তিন মাস, কারবঙ্কলে অমন দুই মাস, আর বসন্ত তো ছিলই। জলবসন্তে মশারির ভেতরে থাকা দিনের পর দিন। তখন পেনসিল আর কাগজ দিয়েছিল মা। আমি খবরের কাগজ লিখতাম। সেই আমার প্রথম লেখা। কল্পনা আর বাস্তবের মিলমিশ করে কিছু লেখার চেষ্টা। একটা বিমান আঁকলাম, তার নিচে খবর লিখলাম, বিমান দুর্ঘটনায় এতজনের মৃত্যু। হ্যাঁ, সেই সময় প্যান-আমেরিকান বিমান দমদমে অবতরণ করতে গিয়ে কৈখালির কলাবনে আছড়ে পড়েছিল। অনেক জীবনহানি হয়েছিল। খবরটা বাড়ির লোকের আলাপে, উত্তেজনায় শুনেছি মশারির ভেতরে বসে। গায়ে নিমপাতা বুলাতে বুলাতে বাবার কাছে জেনেছিলাম কী হয়েছে। আমি এত বয়সে এসে সেই খবরের কাগজ লিখছি ...। করোনার দিনগুলির খবর। ভাইরাস-আক্রান্ত দিনে মানুষের নানা মত মানুষ লিখে যাচ্ছেন। সবই যেন আমার জন্য। অমর তুমি জানো, তুমি শোনো। এই যে কুরুক্ষেত্রের আঠারো দিনের যুদ্ধের পরিণতি সামনে, এই যুদ্ধ এই প্রথম নয়। হিরোশিমা, নাগাসাকি পার করেছে জাপান, চেরনোবিল পার করেছে পূর্ব ইউরোপ, প্লেগ, স্প্যানিশ ফ্লু, ফ্রেঞ্চ ফ্লু ... কত মহামারিতে মরেছে মানুষ। কালান্তক ভাইরাসের ভয়ে মশারির ভেতরে আত্মগোপন করে আমি

আমার মতো করে বিমান দুর্ঘটনার খবর আবার লিখছি। বিমানবাহিত হয়ে এই অদৃশ্য ঘাতক আমাদের দেশ কেন, আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকার একাংশে ঢুকে পড়ে মানুষ মারছে। ছেলেবেলায় মা শীতলার এমন অদৃশ্য পরিভ্রমণের কথা শুনেছি। ঠিক এই সময়ে, এই চৈত্রদিনে, যখন শিমুল-পলাশ ফোটে, বাতাসে কার্পাস, শিমুল তুলো ওড়ে, আমের মঞ্জরিতে দশদিক ম-ম করে, গাজনের সন্ন্যাসীরা গৈরিক বেশ ধারণ করে, মহাদেবের চরণের সেবা লাগি ... ডেকে ডেকে গ্রামের পথে হাঁটে, তখন শেতলাবুড়ি, ওলাওঠাবুড়িও খররোদের ভেতর হাঁটে মানুষের খোঁজে। পথের কুকুর গন্ধ পেয়ে লেজ গুটিয়ে বাগানে, ঝোপেঝাড়ে ঢুকে পড়ে জিভ মেলিয়ে হা হা করতে থাকে। ঠাকুমা বলত, ঘুমো, বাইরে তিনি ঘুরতে আরম্ভ করেছেন, কাওরাপাড়ায় কলেরা লেগেছে ...। আমি তখন করব কী? মশারির ভেতরে বসে খবর লিখছি। সারাজীবন ধরে কত খবর পেয়েছি, এখনো পেয়ে যাচ্ছি, তার সঙ্গে আমার খবর লেখা। রয়টার, পিটিআই, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি), নিজস্ব সংবাদদাতা ... যেমন খবর পাঠাত সেই পৃথিবীতে, তেমন খবরই আমি দেবো, আমি বুড়ো খবরিয়া বলছি সেই অদৃশ্য ঘাতকের কথা। সেই ডাকিনির ঝাঁটায় উড়ান দিয়ে এসে পৌঁছে গেছে মহানগরে। মহানগর থেকে গাধার পিঠে চেপে মফস্বলে গেছে। তেহট্ট, চন্দননগর, শিলিগুড়ি, কেরল, মহারাষ্ট্র, গুজরাত, পাঞ্জাব, দিল্লির মহাসড়ক থেকে অলিগলিতে।

দুই

মাল্যবান, জলপাইহাটি, বাসমতীর উপাখ্যান লেখা হয়েছিল পেনসিলে। জীবনানন্দের গল্প-উপন্যাস আফসার আমেদ কপি করে আনত ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে। ভাইরাস-আক্রান্ত দিনে মানুষের কথা মানুষ লিখে যাচ্ছেন পেনসিলেই। কোনোটি থাকবে, কোনোটি আবার ভেসে উঠে আমার কাছে চলে আসবে দু-বছর বাদে, আমি জানি না। কিন্তু পেনসিলে লেখা উপন্যাস একটিও হারায়নি যেমন, পেনসিলে লেখা শোকের বিবরণ মুছে যাবে না। আশাদীপও নিভে যাবে না। মানুষই তো লিখছে মানুষের কথা। মানুষ বলছে, সবই তোমার উদ্দেশে লেখা। তুমি আমার কথা শোনো। খবরিয়া তুমি জানো, তুমি শোনো। খবরিয়া তোমাকে জানাচ্ছি, তুমি খবরটি দিও। এমন অসুখ পৃথিবীতে আসে কত, মানুষ মরেছে যেমন মানুষ বেঁচেছেও। ভয় পেও না খবরিয়া। তুমি ভয় পেলে খবর নিয়ে ঢোল-সহরত করবে কে? এমনিতে অতিপ্রত্যুষে খবরিয়ার নিদ্রা ভাঙে। তখন বাইরে অন্ধকার। কাকও ডাকে না। কী করবে সে? আন্তরজালে দূর-পৃথিবীর খবর নেয়। বাংলাদেশ, ইউরোপ, আমেরিকা। ভোরে হোয়াটসঅ্যাপ কল করে নিউইয়র্কের খবর নেয়, লস অ্যাঞ্জেলসের খবর নেয়। আর তাকে পাঠান অনেক খবর পড়তে থাকে। তার দেশের খবরও পায়। ঘুম ভেঙে গেলে খবরিয়া ফেসবুকে দেখল অচেনা এক অদিতি সরকার তাঁর মায়ের কথা লিখেছেন। খবরিয়া আর এক মহামারি, অতিমারির কথা শোনো। ৬৩ বছর আগের কথা। তখন হয়তো তুমি মশারির ভেতরে বসে খবর লেখা শুরু করেছিলে। এই খবর পাওনি। এখন দিলাম তোমাকে।

অন্য এক অতিমারির কাহিনি

১১ই মে, ১৯৫৭।

ভারত সরকারের ইনফ্লুয়েঞ্জা সেন্টারে (কুনুর, দক্ষিণ ভারত) খবর এসে পৌঁছল যে, জাপান আর মালয়েশিয়া পার করে ভয়ংকর এশিয়ান ফ্লু এবার রওনা দিয়েছে এদেশের দিকে। ১৯৫৬-র শেষাশেষি এই ফ্লু-র উৎপত্তি হয়েছিল চীন দেশের গুইজু প্রদেশে। হাঁস থেকে মানুষের শরীরে এসেছিল এই ফ্লুর ভাইরাস। অতিদ্রুত ছড়াতে ছড়াতে ১৯৫৭-র ফেব্রুয়ারিতে সেটি পৌঁছে যায় সিঙ্গাপুরে এবং এপ্রিলে পা রাখে হংকংয়ে।

১৫/ ১৬ই মে, ১৯৫৭।

১৬২২ জন যাত্রী ও ২০০ জন ক্রু নিয়ে এসএস রাজুলা জাহাজটি সিঙ্গাপুর থেকে রওনা হয়েছিল মে মাসের ৯ তারিখে। তার প্রথম থামার কথা ছিল ভারতের নেগাপত্তম বন্দরে। কিন্তু সাতদিনের মধ্যে জাহাজের ২৫৪ জন ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হন। এই খবর পাওয়ামাত্র জাহাজটিকে নিয়ে যাওয়া হয় তদানীন্তন মাদ্রাজ বন্দরে। ১৬ই মে সকালে জাহাজ মাদ্রাজ পৌঁছয়। সেই সময় জাহাজে চুয়াল্লিশজন রীতিমতো ফ্লুতে ভুগছিলেন। জাহাজটিকে সমুদ্রের বুকেই কোয়ারেন্টাইন করে রাখা হয় এবং কুনুর থেকে একটি মেডিক্যাল টিমকে ও একটি ল্যাবরেটরি টিমকে রোগীদের চিকিৎসার জন্য তথা লালার নমুনা সংগ্রহ করার জন্য জাহাজে পাঠানো হয়।

১৮ই মে, ১৯৫৭।

যে-নার্সেরা ১৬ তারিখে এসএস রাজুলায় উঠেছিলেন, তাঁদের মধ্যে চারজনের শরীরে ফ্লুর লক্ষণ ফুটে ওঠে। ভারতে মহামারির প্রথম দিন। পরে এটি পৃথিবীব্যাপী অতিমারি ঘোষিত হয়েছিল।

অক্টোবরে প্রথম সংক্রমণের পর জানুয়ারিতে উত্তর চীন, ফেব্রুয়ারিতে সাংহাই, এপ্রিলে হংকং এবং মে মাসের মাঝামাঝিতে মাদ্রাজ। বোম্বাইয়ে (আজকের মুম্বাই) প্রথম রোগ সংক্রমণের কথা জানা যায় ২১ মে, এবং সেই একই সপ্তাহে কলকাতাতেও দুটি সংক্রমণের খবর পাওয়া গিয়েছিল। প্রথম মৃত্যুর খবর আসে জুন মাসের ১ তারিখে। এর পরে সারা

পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এই ফ্লু।

***

মে মাসের শেষদিক, কলকাতা, ১৯৫৭

খুব বেশিদিন বিয়ে হয়নি মেয়েটার। হবে হয়তো মাস ছয়েক। কলকাতায় মে মাসের শেষ মানেই অসহ্য চিটচিটে গরম। সোদপুর থেকে লোকাল ট্রেনে শেয়ালদা, সেখান থেকে আবার বাসে গুঁতোগুঁতি করে হেস্টিংসের মেরিন হাউস পর্যন্ত আসতে আসতেই বেচারী রোগা-পাতলা পঁচিশের তরুণী হাঁফিয়ে পড়ত। অফিস অবশ্য একেবারে গঙ্গার ধার ঘেঁষে প্রায়। এলাকাটাও ফাঁকা ফাঁকা। খুব যে খারাপ লাগত তা নয়। তবু চাকরিটা ছাড়বে ঠিক করে ফেলেছিল সে। অনেকগুলো অ্যাপ্লিকেশনও পাঠিয়ে দিয়েছিল এদিক-ওদিক। কারণটা একমাত্র সে ছাড়া আর কেউই জানত না যদিও।

আসলে মেরিন হাউস মানেই সারাদিন দেশি-বিদেশি জাহাজিদের ভিড়। ওই গুঁতোগুঁতি, ওই ঘেমো গন্ধ, চিৎকার আর কান-জ্বালানো ভাষা একেবারেই যেন হজম হতো না মেয়েটার। দূরত্বটাও অনেকটাই পড়ছিল। ভালো লাগছিল না তার আর।

সেদিনও একটা ইন্টারভিউয়ের জন্যই বসে ছিল একটা অফিসের লাউঞ্জে মেয়েটা, যখন কাঁপুনি দিয়ে জ্বরটা এলো। চোখে অন্ধকার দেখতে দেখতে কোনো রকমে উঠে দাঁড়াল মেয়েটা। এরকম শরীর খারাপ তার আগে কখনো লাগেনি। বুঝতেই পারছিল তার আর ইন্টারভিউ দেওয়া হয়ে উঠবে না। কী করে শেয়ালদা গিয়েছিল, কী করে সোদপুর পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছিল কিচ্ছু আর মনে নেই তার।

তারপর প্রায় কুড়িদিনের কথা তার জীবন থেকে মুছে গেছে। পরে শুনেছিল তার নাকি এশিয়ান ফ্লু হয়েছিল। সম্ভবত ওই মেরিন হাউসের কোনো জাহাজির দৌলতেই। ডাক্তার হাসপাতালে নিতে চাননি, বলেছিলেন বাড়িতেই আইসোলেশনে রেখে সেবা করতে। ওদিকে তার বাড়িতেও তখন বলতে গেলে কেউই নেই। ভাসুর আর্মির ক্যাপ্টেন, ঝাঁসির কাছে বাবিনা বলে এক সেনাছাউনিতে পোস্টেড। তাঁর স্ত্রীর প্রথম সন্তানসম্ভাবনা, শ্বশুর-শাশুড়ি গেছেন সেখানে। দেওরের তখনো বিয়ে হয়নি। সেবা করার লোক বলতে স্বামী।

সে-ভদ্রলোক অবশ্য ওই কাজটিতে বেজায় পটু ছিলেন। বরং বাড়ি ফাঁকা থাকায় তার সুবিধাই হয়েছিল। জান লড়িয়ে দিলেন স্ত্রীকে সুস্থ করতে। তবু মেয়েটা দিন দিন যেন আরো দূরে চলে যাচ্ছিল।

ষোলো দিনের মাথায় নাড়ি ক্ষীণ থেকে অতিক্ষীণ। চোখের পাতা টেনে তোলা যাচ্ছে না। ডাক্তার বললেন, শেষ চেষ্টা কোরামিন দিতে। দেওয়া হলো। তারপর অপেক্ষা।

আস্তে আস্তে ফ্যাকাশে ঠোঁটে সামান্য রং ফিরে এলো। চোখের পাতায় কাঁপুনি। ঘোলাটে চোখ একটু ফাঁক হয়ে আবার বুজে গেল। ক্রাইসিস কেটেছে, বললেন ডাক্তার।

আরো দুদিন পর চোখ খুলে জড়ানো গলায় মেয়েটা প্রথম কথা বলেছিল, লুচি খাব।

***

এরও দু-বছর পর মেয়েটা মেয়ে থেকে মা হয়েছিল। আমার মা। আর হ্যাঁ, মেরিন হাউসের চাকরিটা ছেড়েই দিয়েছিল সত্যি সত্যি। অন্য একটা অফিসে ঢুকেছিল।

সেদিন মা-র বয়স ছিল ২৫, আজ ৮৮। সেদিন তারুণ্যের যে-শক্তি দিয়ে লড়াইটা থেকে জিতে ফিরেছিল মা, আজ চাইলেও যে আর সেই শক্তিকে জোটাতে পারবে না শরীরে। করোনা ভাইরাস, হাত জোড় করি তোমায়, পায়ে পড়ি। ফিরে যাও, ফিরে যাও।

অদিতি সরকার।

মানুষ গৃহবন্দি হয়ে তার কথা লিখে যাচ্ছে। লিখবেই তো। লিখতে পারা এখন বলতে পারা। বলতে পারলে অনেক চাপ কমে যায়। মানুষ উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। যে যতই বলুক, মানুষ এক স্বার্থপর প্রজাতি। সভ্যতার এই বিপুল সমৃদ্ধি মানুষকে আরো স্বার্থপর করেছে। কিন্তু তাই-ই সব নয়। স্প্যানিশ ভাষাবিদ জয়া কুণ্ডু গত রাতে কী লিখে গেছেন আমার জন্য, তা পড়ে দেখছি আধো-অন্ধকারে। কোথায় বারসিলোনা, মাদ্রিদ; জয়া খুব উদ্বেগে আছেন আটলান্টিকের উপকূলের জন্য।

'স্প্যানিশ ডেইলি পড়ছিলাম। উফ্‌ফ শুধু আতঙ্ক। দেশটা বিধ্বস্ত পুরো। ৭২২৪৮ জন সংক্রমিত, মারা গেছে ৫৭০৪, আর তার মধ্যে শুধু আজ সারাদিনে ৮৩২ জন।

স্পেনের সাইজ আমাদের পশ্চিমবঙ্গ আর বিহারের এক খাবলা নিলেই শেষ। ওইটুকুতে এত পরিসংখ্যান। সমানে নিউজে বলে যাচ্ছে Quedate en lA case. Es obligatorio বারবার এক কথা। বাড়ি থাকা ছাড়া আর কিছু রেমেডি নেই। কদিন আগে ফোন করেছিলাম বার্সিলোনায়। বন্ধু বলল – এখানে তো Jaleo হয়ে গেছে। মানে সোজা কথায় তাণ্ডব লেগে গেছে।

আর আমাদের দেশে কী অবস্থা? সাইট খুলে বুঝতেই পারছি না কতজন এফেক্টেড? ৯১৮ জন সংক্রমিত আর ১৯ জন মৃত আজ পর্যন্ত। এই তথ্য বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় আপনার? ভারতের সাইজ স্পেনের কত গুণ? জনসংখ্যা কত গুণ? দেখলাম আজ প্রধানমন্ত্রী বৈঠক করেছেন আয়ুশ প্র্যাকটিশনারদের সঙ্গে মানে আয়ুর্বেদ, যোগা, ইউনানি, হেকিমি ইত্যাদি যারা করে। এই হচ্ছে ভারতের মতো মিনি মহাদেশের কর্ণধারের প্রচেষ্টা।

আমরা বাঁচলে বাঁচব এমনিতেই, দৈবকৃপায় বাঁচব। মরতে পারব না বলেই বাঁচব। নইলে ...' জয়া।

এর ভেতরেই কাটোয়ার জপমালা ঘোষ রায়ের কথা কানে এলো। কবিতা লেখে। কথা বলতে ভালোবাসে। আনন্দে থাকতে চায়। সে যেন ডাকছে, দাদা, দাদা, আমার কথা শোনো, দাদা, আমি কেমন ভাবে বেঁচে আছি, দাদা, আমিও তোমাদের কথা শোনার জন্য ভালো থাকতে চাই ...

'৩-৪ মাস হলো অসুস্থতার কারণে খুব একটা কাজ করতে পারি না। ওষুধ কিনতে রাস্তায় বেরোলে বুকে চাপ লাগে পড়ে যেতে যেতে সামলাই পথচারীরা বাঁচান। এখন তো সব কাজ করতে হচ্ছে। ১০০০ স্কোয়ার ফিট দোতলা বাড়ির স্যানিটেশন বজায় রাখতে গিয়ে কখনো ঘরের মেঝেয় বা সিঁড়ির চাতালে ঝাঁটা বা ঘর মোছা লাঠি নিয়েই শুয়ে পড়ছি। একটু সুস্থ হলে আবার উঠছি। কখনো বিছানার চাদর কাচতে গিয়ে বাথরুমের জলের মধ্যেই শুয়ে পড়ছি। এমনিতে অন্যান্য প্রবলেম আগের চেয়ে কম কিন্তু হার্টে একটু সমস্যা হচ্ছে, কিছুই করার নেই। করতেও হবে। যতটা পারি। কিন্তু ভয় ভয় করছে। এগুলো বলার কথা নয়। তাও বললাম। কাকেই বা বলব। অদ্ভুত আঁধার।'

জপমালা।

তিন

দেশ-বিদেশ থেকে আতঙ্কের খবর ভেসে আসছিল। কত ভয়ের কথা। আমেরিকায় কত বন্ধু। নিজের কন্যা, জামাতা, ছ-বছরের ঝিলমিল আছে শারলট সিটিতে। ওদের জন্য উদ্বেগে আছি। কতরকম ভাবনা হয়। মানুষের মন। মন কেন আছে মানুষের? অন্য প্রাণী কি স্মৃতিকাতর হয়? যে-বাঘিনির সন্তান মাকে ছেড়ে জঙ্গলে কোথায় চলে গেছে, সেই বাঘিনির কি সন্তানটির কথা মনে পড়ে? তার প্রাণ সংশয় হয়নি তো। সে ভালো আছে তো। শিকারির বন্দুকের গুলি তাকে বিদ্ধ করেনি তো? বাঘিনি কি এইসব উদ্বেগ নিয়ে কাতর হয়ে থাকে, নিদ্রা যায় তার? বাঘ তো সন্তানের খোঁজই রাখে না। আমরা বন্যজীবন পার করেছি কত সহস্র বছর। কিন্তু নগরে গড়েছি কৃত্রিম বন। তবু মানুষ এখনো বাঘ হয়ে ওঠেনি। বাঘিনিও হয়নি কোনো মা। বুড়ি হয়ে যাওয়া মা, তার মধ্যবয়সী পুত্র-কন্যার জন্য কাতর হয়ে থাকে, শিলিগুড়িতে বসে মা বারবার ডাক দেয় কলকাতায় আটকাপড়া মেয়েকে।

শারলট সিটিতে লকডাউন চলছে। ঘরে বসে কাজ। খাদ্য অনলাইনে অর্ডার করলে চলে আসছে। উত্তর ক্যারোলাইনা রাজ্যের ছোট্ট শহর শারলট সিটি। ওই শহরে আমি গিয়েছিলাম এই সময়েই। ২৮ কিংবা ২৯ মার্চ। সড়কপথে ৭৫০ মাইল। সব মিলিয়ে ২১-২২ ঘণ্টা লেগেছিল। সেই ছবির মতো শহরে সকলে ঘরে ঢুকে বসে আছে। বন থেকে বেরিয়ে আসছে হরিণ, ভালুক, খরগোশ; তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, পথ শুঁকে শুঁকে হেথাহোথা যাচ্ছে। হরিণ অবাক হয়ে বন্ধ ম্যাকডোনাল্ড, পটেল ব্রাদার্সের দিকে তাকিয়ে আছে। সকালে কিছু সময় খুলে দুপুর থেকে তাদের ঝাঁপ বন্ধ হয়েই থাকে।

ভয়ের ভিতরে ভয়

ইতালি আত্মসমর্পণ করেছে। মৃত্যু মৃত্যু মত্যু! আমেরিকায় মৃত্যু বাড়ছে। নিউইয়র্কনিবাসী লুৎফুন্নাহার লতা নিয়মিত খবর দিয়ে যাচ্ছেন। লতা আপার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ২০১৮-র এই সময় মিশিগানে, তারপর ১৪ এপ্রিলের পর নিউইয়র্কে। লতা বাংলাদেশের মঞ্চ এবং টেলিভিশনের জনপ্রিয় অভিনেত্রী ছিলেন। উপস্থাপিকা ছিলেন। রাশিয়ান-আমেরিকান মার্ক সায়েবকে বিয়ে করেছেন। মার্ক ধুতি- পাঞ্জাবি পরেন। এক অনুষ্ঠানে উইকি থেকে আমার সম্পর্কে তথ্য নিয়ে বলতে আরম্ভ করলেন ভাঙা বাংলায়। লতার লেখা পড়ে বুক ভেঙে যায়। আমি এই চেরি প্রস্ফুটনের সময় ওই দেশে ছিলাম। লতা এক সুন্দরী বছর বত্রিশের মায়ের মৃত্যুসংবাদ শেয়ার করেছেন। তিন সন্তানসহ ত্রিশ-বত্রিশের মায়ের ছবি কী সুন্দর! বাংলাদেশের ঢাকার নিকটবর্তী মুন্সীগঞ্জের কাজি হাসান

লিখছেন ...

২৬.০৩.২০

কাজি হাসান, গেণ্ডারিয়া, মুন্সীগঞ্জ

নিউইয়র্কে করোনাভাইরাসে

মুন্সীগঞ্জের তৃশার মৃত্যু!

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মুন্সীগঞ্জের সিরাজদীখান উপজেলার তেলিপাড়া গ্রামের সন্তান, তিন সন্তানের জননী আমিনা ইন্দালিব তৃশার (৩৯) মৃত্যু হয়েছে গত ২৩ মার্চ (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। তার এক ছেলে ও দুই মেয়ে। স্বামীর নাম বোরহান চাকলাদার। এ নিয়ে নিউইয়র্কে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করা তিন বাংলাদেশির মধ্যে তিনি একজন। চার বছর আগে তৃশা সপরিবারে আমেরিকায় পাড়ি জমিয়েছিলেন।

নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডের বাংলাদেশ সোসাইটির কবরস্থানে আজ ২৬ মার্চ নিউইয়র্ক সময় ১০টায় জানাজা শেষে তাকে সমাহিত করা হবে বলে পরিবারের সদস্যরা জানান।

আমরা তৃশার বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি ...

সূত্র : সভ্যতার আলো

চার

পেনসিলে যা লেখা হবে

সকাল ৬টায় বেরিয়েছি সওদা করতে। বেলগাছিয়া মোড়ে চলে গেছি পাউরুটি-বিস্কুটের সন্ধানে। ওপারে খুব বড় মুসলমান বস্তি। গরিব মানুষের বাস। বড়লোকরা এদিকে ফ্ল্যাট কিনে, মস্ত প্রাসাদ হাঁকিয়ে চলে এসেছেন প্রায় অচ্ছুৎ গরিবের বসতি ছেড়ে। রাস্তার ওপারে মসজিদ হয়েছে একটি। আগে ছিল না। এই বস্তিতেই থাকে আমাদের রুকসানা মাসি। বাড়ি বাড়ি কাজ করে বেড়ায় সারাদিন। আমার স্ত্রী মিতালি বলেছে, ১ তারিখে এসে বেতন নিয়ে যেও মাসি। যখন আসতে বলব, তখন এসো। তোমার কাজ যাবে না। ছুটিতে থাকো। কী দেখলাম, রুকসানা মাসি, তেলচিটে সালোয়ার-কামিজ, লাল উড়নি নিয়ে বস্তির গলিপথ থেকে বেরিয়ে আসছে। ছোটখাটো বছর চল্লিশের নারী। রোগা। কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে আছে, চোখ কোটরে ঢুকে আছে, প্লাস্টিকের চটি ফটফট করতে করতে ওড়নায় মুখ চাপা দিয়ে রাস্তা পার হয়ে এসে আমাকে দেখে দাঁড়াল, বেরিয়েছ দাদা, কী কিনবে, ডিম, মাংস, মাছ, টাকা দাও, আমি কিনে দিয়ে আসছি।

আহা না মাসি, তুমি কোথায় যাচ্ছ? তফাতে সরে জিজ্ঞেস করলাম।

কাজ সারতে, সবাই তো ছুটি দেয়নি দাদা, তুমি কেন দিলে, বউদির কত কষ্ট হচ্ছে, তুমি তো কিছু করো না, শুধু লিখো। বলল রুকসানা অভিযোগের সুরে।

এখন ঘরে থাকতে হবে মাসি, তুমি ওদের বলো।

না, ছুটি করলে বেতন দেবে না, বেতন না দিলে চলবে কী করে? বলে রুকসানা চলল তার কাজের বাড়ি। আমি বিস্কুটের দোকানের সামনে। চতুর দোকানির খুব ফুর্তি। দোকান খালি হয়ে গেছে। রুটি আসছে না। যা আছে সব সস্তার বিস্কুট। অনামি কোম্পানির বিস্কুট। আমাকে বলল, নিয়ে নিন নিয়ে নিন, এরপর এসবও মিলবে না, কোল ড্রিংক আছে, নিয়ে যান, পরে পাবেন না, আইসক্রিম আছে, পাবেন না পরে। বলতে বলতে তফাতে দাঁড়িয়েই দোকানি লম্বা এক হাঁচি বের করল নাকের দুই ছিদ্র থেকে। হেঁচে দিলো, ভয়ে সরে গেছি। মাস্কে ঢেকে আছি নাক-মুখ, তবু বিরক্তি প্রকাশ করলাম। বললাম, সব আইসক্রিম তুমি খাও, জানো না মুখে চাপা দিয়ে হাঁচতে হয়?

এক বৃদ্ধের মুখ ঢাকা কাপড়ে। খুকখুক করে কাশছিলেন। তিনি বৃদ্ধ রিকশাওয়ালা, দুদিন আগে তাঁর রিকশায় আমি চাল, আটা ইত্যাদি নিয়ে গেছি, অনেক উপদেশ দিয়েছি, অভয় দিয়েছি, সতর্ক করেছি। আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। কিন্তু এই কাশি তো স্বাভাবিক কাশি। বিড়ি ফেলেছেন তিনি সুখটান দিয়ে এই তো এখনই। কিন্তু আতঙ্ক ছাড়ছিল না। দ্রুত সরে এলাম। পাউরুটি বিক্রেতা রাস্তায় রুটি আনছিল। রুটি নেব বলতে সে ঘাড়ের কাছে এসে কথা বলতে লাগল, কেন পাঁচ টাকা বেশি লাগবে। ভয় করতে লাগল। সরে দাঁড়ালাম। ভয় করতে লাগল খুব। এই ভয় আমাকে জড়িয়েই আছে। কবি মৃদুল দাশগুপ্ত যা বলেছিল, তা সত্যিই। আমি ভীরু। আমাদের দেশে কত মানুষ, নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে কেনাকাটা আমাদের হবে কী করে? সেই জায়গাই নেই। এখন রাস্তায় গাড়িঘোড়া নেই, তাই দূরে দূরে দাঁড়াতে পারছি। সবজিওয়ালা, ডিমওয়ালারা, ফল-বিক্রেতারা তাদের ঝাঁপি খুলছে। সরকারের রুই মাছ আসছে, তা বিক্রি শুরু হবে, গোটা নিতে হবে, ১৫০ টাকা প্রতি কিলো। তার ব্যবস্থা করছে যারা, সংখ্যা অন্তত জনা আট, সকলেই নিঃশঙ্কচিত্ত, সকলের মুখে কাপড়ের পট্টি মাস্ক। তা খুলে কথা বলছে। বাজার বসার আয়োজন হচ্ছে। চায়ের দোকান চালায় যে রুগ্ণ মেয়েটি সে এর ভেতরে চা করে ফেলেছে। থালায় করে চা-বিস্কুট নিয়ে যাচ্ছে সবজিওয়ালাদের জন্য। আমাকে জিজ্ঞেস করল, কাকু চা খাবেন। মাথা নাড়লাম। বস্তির যে-ছেলেটি ছেলেবেলায় আমার সঙ্গে টালা পার্কে খেলত, এখন বহুদিন ভয়ানক বৃদ্ধ, হাড় ছাড়া শরীরে কিছু নেই, চোখদুটি ঢুকে আছে আঁখি-কোটরে, পা টেনে টেনে হাঁটে, বুকের খাঁচা নড়বড়ে, চাপ দিলেই যেন পটপট করে ভেঙে যাবে, বাংলা মদ খেয়ে খেয়ে, নাকি না খেয়ে খেয়ে এমন অবস্থা, কোন কারখানায় কাজ করত, এখন বাজারই তাকে খেতে দেয়। এর-ওর ফাই-ফরমাশ খাটে, কোনো বাবু, যে ছিল তার বাল্যকালের খেলার সাথি, তাকে দিয়ে বাজার পাঠিয়ে দেয় বাড়িতে। সে কোনোক্রমে বয়ে নিয়ে যায়। দিয়ে এসে পাঁচ টাকা পায় হয়তো, তাকে দেখে মনে হয় যে-কোনোদিন মরে যেতে পারে, এরকম মনে হচ্ছে অনেকদিন, তা প্রায় বছরকয়েক ধরে; কিন্তু সে আছে, বেরিয়ে এসেছে বাজারের পেছনের বস্তি থেকে, চা খাবে। মেয়েটি তাকে বলল, বোসো বেঞ্চিতে, আসছি দিয়ে। সে আমাকে দেখে হাসল। সত্যিই হাসল। বহু বছর বাদে আমার সঙ্গে কথা বলল, খুব ভয় লেগেছে গো, সত্যি অমন হবে?

আমি কতকাল বাদে তার কথায় দূরত্ব রেখে দাঁড়িয়েছি, কী নাম যেন, ঘুঘু, কঞ্চি ... মনে পড়ছে না। খুব চতুর, বুদ্ধিমান ছিল কম বয়সে, বাজারে এসে গেঁড়াতে ওস্তাদ ছিল, কলা, বেগুন, মুলো পটাপট তুলে নিয়ে নিজের থলেতে ভরে নিত। হাসলাম সেসব কথা মনে করে, বললাম, সাবধানে থেকো।

তুমিও সাবধানে থেকো, আমার কিছু হবে না, চা খাবে বাবুজি? সে আমার ছেলেবেলার নামটি মনে রেখেছে। আমি তার নাম ভুলে গেছি। ঘুঘু, কঞ্চির বাইরে একটা নাম ছিল, ভুলে গেছি, মাথা নেড়ে বললাম, তুমিই খাও।

আচ্ছা, আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে, বলবে? ভাঙা গলায় সে বলল।

ঘর থেকে একদম বেরোবে না।

এ তো মোদি বলছে, মমতা বলছে, টিভিতে বলছে, তুমি কী বলছ?

আমিও ওই কথা বলছি।

তা'লে আর নতুন কী বললে, আমার কিছু হবে না। সে চায়ে চুমুক দিলো আয়েশ করে।

না, কাজ না থাকলে বাড়ি যাও। আমি বোঝাতে চাইলাম, ঘরে বসে থাকো।

আবে, আমার ঘর তো ঘরই না, একটা ঘর, বউ, দুই মেয়ে, ভাগ্নি এসে জুটেছে, ঘরেই রান্না, বউ লোকের বাড়ি কাজ করে, ঘুমোনোর সময় ছাড়া ঘরে থাকিনে, ঘরে থাকলে মরে যাব, তুমি একদিন দেখে এসো। সে বলল, আমার ঘর আছে যে ঘরে যাব? কুকুর-বেড়ালের মতো থাকি।

কী বলব, চুপ করে আছি।

কুকুর-বেড়ালের হচ্ছে না তো? সে জিজ্ঞেস করল।

মাথা নাড়লাম, বললাম, মানুষ থেকে মানুষে চলে যাচ্ছে, ছোঁয়াচে খুব।

দূর, আমি আবার মানুষ নাকি, লেড়ি কুত্তাকে বিস্কুট খাওয়ায় দেখেছ, আমাকে তাও দেয় না, হবে না, লেড়ি কুত্তার হবে, আমার হবে না। বলে সে তার টিংটিঙে পা নাচাতে লাগল, ওসব তোমাদের রোগ, বাড়ি যাও তুমি। বলে বিড়ি বের করল বুকপকেট থেকে, বিড়িতে আগুন দিলো দেশলাই জ্বালিয়ে, ধোঁয়া উড়িয়ে দিলো, বলল, ঘর থেকে বেরোবে না, ঝামেলা যাক, একদিন দেখতে এসো আমার ঘর, বুঝবে। আমি চললাম। ডিম, চিকেন, মাছ, রুটি সবজি নিয়ে চললাম। পাতিলেবু নেওয়া হয়নি। নিতে হবে। লকডাউন চলছে। লেবু নিয়েই বাড়ি। ঘরে ফিরে কাগজ, পেনসিল, ঘুঘু ...।

Tags

অমর মিত্র   পেনসিলে লেখা খবর

Share

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

বাড়ি ৪২ , রোড ২৭ , ধানমন্ডি
শেখ কামাল সরনি , ঢাকা ১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন : +৮৮০ ২ ৪১০২০৮২৩, ০২ ৪১০২০৮২৪, ০৯৬১৩ ০২০৮২৫

প্রকাশক: আবুল খায়ের
সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি: সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
সম্পাদক: সুব্রত বড়ুয়া
সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য: রুবী রহমান, লুভা নাহিদ চৌধুরী
© সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত